গ্রেগর জোহান মেন্ডেল

বংশগতি-বিদ্যার জনক

সব্যসাচী রায়চৌধুরী

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

॥ প্রাক্-কথন ॥

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল। বংশগতি বিজ্ঞানের জনক। এঁর জীবনালেখ্য লিখবার সুযোগ পেয়ে আমি যেমন আনন্দিত তেমনি 'গ্রন্থতীর্থ'-র কর্ণধার শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়ক মশাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ না করলে এ কাজে হাত দেওয়া হত না।

জীববিজ্ঞান তথা প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি বরাবরই বংশগতিবিদ্যার প্রতি একটু বেশি অনুরাগী। বংশগতি বিজ্ঞান, জীববিদ্যার একটি শাখা, জেনেটিক্স (genetics) নামেই তার বেশি পরিচিতি। বাস্তবিক, এই একুশ শতকে 'জিন'-এর নাম শোনেন নি, কিংবা, কীভাবে দম্পতির বৈশিষ্ট্য সন্তানে অর্পিত হয় সে বিষয়ে অল্পবিস্তর জানেন না এমন শিক্ষিত মানুষ বিরল। কিন্তু, দেড়শো বছর আগে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ বিষয়ে জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত। জীববিদ্যার যাঁরা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী ছিলেন, এমনকী তাঁরাও, ভ্রূণের মধ্যে জনিতৃর বৈশিষ্ট্য সঞ্চার সম্বন্ধে ভ্রান্ত কিংবা অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন। তারও আগে বহু শতক ধরে নানা ধরনের এলোমেলো গবেষণার পথ ধরে চারিত্র্য বা বৈশিষ্ট্যের সঞ্চরণ এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ সম্বন্ধে কিছু কিছু অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল ইউরোপে।

চার্চ-শাসিত ইউরোপ বিশ্বাস করত এই বিশ্বের সমস্ত প্রকৃতি ও সকল জীব, এমনকী সমস্ত প্রজাতির মধ্যে বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য— সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। এর মধ্যে কোনও বিজ্ঞানগত কারণ অনুসন্ধান করতে যাওয়া শুধু বৃথা নয়, অনৈতিক।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অস্ট্রিয়ার (বর্তমান চেক প্রজাতন্ত্র) ব্রুন শহরের এক বিখ্যাত চার্চের একজন অনুগত যাজকের হাত ধরেই জন্ম নিল এক নতুন বিজ্ঞান— জনিতৃর বৈশিষ্ট্য পরপ্রজন্মে সঞ্চারিত হবার বৈজ্ঞানিক কারণ ও তার নিয়ম সম্পর্কিত প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটন হল। চার্চের নাম অগাস্টিনিয়ান অ্যাবে অব সেন্ট টমাস, যাজকের নাম গ্রেগর জোহান মেন্ডেল।

অত্যাশ্চর্য তাঁর জীবনকথা। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ও তথ্য সংগ্রহে, গবেষণার বিষয়-উপাদান নির্বাচনে, পরীক্ষার খুঁটিনাটি-নিখুঁতত্ত্বে ও ফলাফলের বিশ্লেষণের অভিনবত্বে বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এই মঠবাসী যাজক। অগাস্টিনিয়ান মঠেরই ছোট্ট একটুকরো জমিতে, মটর গাছ লাগিয়ে, তার উপর প্রায় দশবছর ধরে অবিরাম শ্রমসাধ্য পরীক্ষা চালিয়ে তিনি বংশানুসৃতির কয়েকটি অভ্রান্ত ও অমোঘ সূত্র আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৬৫ সালে তিনি প্রকাশ করেছিলেন সে কথা, তৎকালীন বিদ্বজ্জনসভায়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের এবং সেই মনীষী যাজকেরও যে তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের

গুরুত্ব উপলব্ধ-ই হল না সমসাময়িক বিজ্ঞানীসমাজে। এমনকী যথেষ্ট প্রচারও পেল না তাঁর গবেষণা। অনেকেই তাঁর কাজকে মনে করেছিলেন, যাজকের মনের খেয়াল। অন্ধকারে হারিয়ে গেল, অবজ্ঞা ও বিস্মৃতির অন্তরালে লুপ্ত হল তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার। ১৮৮৪ সালে মৃত্যু হল সেই প্রতিভাবান 'বিজ্ঞানী' অনুসন্ধিৎসু যাজকের।

তাঁর মৃত্যুর ১৬ বছর পর, ১৯০০ সালে পৃথিবীতে এই বিজ্ঞানের চর্চা যখন আরও একটু বিস্মৃতি পেয়েছে, তখনই, পৃথিবীর তিন দেশের তিনজন বিজ্ঞানী আলাদা আলাদা গবেষণায় জানতে পারলেন, ৩৫ বছর আগেই এই বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রগুলি অভ্রান্তভাবে আবিষ্কার করেছিলেন গ্রেগর জোহান মেন্ডেল। পুনরাবিষ্কৃত হলেন তিনি। পেলেন মরণোত্তর খ্যাতি।

বিশ শতক জুড়ে এবং একুশ শতকের সাম্প্রতিক দশকেও জীববিদ্যার এই শাখাটি, বংশগতিবিদ্যা যার নাম, যে উত্তুঙ্গ বিস্ময়কর আবিষ্কার ও প্রায়োগিক কৌশলে মানবসমাজের অভূতপূর্ব কল্যাণসাধন করে চলেছে, তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল সেই মহান যাজক গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের হাতেই। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিয়ে আজ নতমস্তকে সম্মান জানান পৃথিবীর সমস্ত জিনবিজ্ঞানী।

জীবদ্দশায় তিনি তাঁর স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু মরণোত্তর খ্যাতিতে জিনবিজ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। বিশ শতকের প্রথমার্ধের একজন মহান জিনবিজ্ঞানী টমাস হান্ট মরগ্যান (১৯৩৩ সালের নোবেল বিজয়ী) বলেছেন

'মেন্ডেল মঠোদ্যানে দশবছর উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন জীববিজ্ঞানের বিগত ৫০০ বছরের ইতিহাসে তা শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার।'

এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনকথা লিখতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই গ্রন্থ রচনার পিছনে 'গ্রন্থতীর্থ'-র কর্ণধার শ্রীশঙ্করীভূষণ নায়ক এবং সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক অভিজিৎ সেন ও অধ্যাপিকা ড. কৃষ্ণা রায়ের সাহায্য অনিবার্য ছিল। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

২০ মার্চ ২০১০ গ্রন্থকার
সিউড়ি, বীরভূম

সূচিপত্র

জন্মভূমি ও বংশপরিচয়	১৩
শৈশব ও শিক্ষারম্ভ	১৬
জীবনের সন্ধিক্ষণ : কলেজ শিক্ষা	২১
যাজক হলেন জোহান মেন্ডেল	২৭
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে	৩৬
যাজকের বিজ্ঞানবীক্ষা : পশ্চাৎপট	৪৪
গ্রেগর মেন্ডেল ও মটরগাছ অবিস্মরণীয় গবেষণা ও যুগান্তকারী আবিষ্কার	৫৩
বংশানুসৃতি ও মেন্ডেলের প্রকল্প : অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর	৭৬
জীবনের উপান্ত দিন	৮৬
'পুনরাবিষ্কৃত' মেন্ডেল : মরণোত্তর স্বীকৃতি	৯১

॥ এক ॥

জন্মভূমি ও বংশপরিচয়

এখন জায়গাটাকে সবাই চেক রিপাবলিক নামে জানে। কিন্তু, উনিশ শতকের প্রথম দিকে, সেই ১৮২২ সালে, ওই দেশটার নাম ছিল অস্ট্রিয়া। তার উত্তরাংশে ছিল মোরাভিয়া আর সাইলেসিয়া। সেখানকার একটি ছোট্ট গ্রামের নাম হাইন্‌জেন্‌ডর্ফ (Heinzendorf)। এখন আর ওই নামে কোনও গ্রাম নেই সেখানে। গ্রামের নাম, রাজ্যের নাম, দেশের নাম সবই বদলে গেছে। এসব হল রাজনৈতিক বিপ্লব আর উত্থানপতনের ফলাফল। যুদ্ধ আর দেশ দখল, জয় আর পরাজয় পালটে দেয় দেশের পুরনো নাম আর সীমারেখা; কিন্তু পালটাতে পারে না সেখানকার মাটি আর মানুষদের জীবনযাপনের ইতিহাস।

সেই অস্ট্রিয়ার উত্তর মোরাভিয়া অঞ্চলে, হাইন্‌জেন্‌ডর্ফ গ্রামে, এখন যার নাম হয়েছে হিঞ্চিৎসে (Hyncice),

সেখানে এক গরিব চাষি ছিলেন। নাম অ্যান্তন মেন্ডেল। সামান্য কিছু জমিজমা ছিল তাঁর। জমির মালিকানা অন্যের, তবে চাষের ফসলের ভাগ পান তিনি। শাকসবজি, ফলমূল, ভুট্টার চাষ করে সংসার চলত। হাড়ভাঙা খাটুনি হত তাঁর। পরিশ্রমের চেয়ে আয় কম হত, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হত, তাই মেজাজ ভালো থাকত না সবসময়। লোকে তাঁকে খিটখিটে আর বদমেজাজি মানুষ বলেই চিনত। তবুও প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাবের কোনও অভাব ছিল না। খুব পরিশ্রমী, জেদি আর একগুঁয়ে ছিলেন অ্যান্তন। টানাটানি করে সংসার চলে যেত কোনোরকমে। সংসারে খুব কঠোর ছিল তাঁর শাসন। সংসার বলতে স্ত্রী, দুই মেয়ে আর এক ছেলে।

তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রোজাইন। বেশ হাসিখুশি মহিলা ছিলেন তিনি। বড়ো মেয়ের নাম ভেরোনিকা, তারপর ছেলে জোহান, সবশেষে আবার মেয়ে থেরেসিয়া। আমাদের গল্পের নায়ক ওই ছেলেটি।

মোরাভিয়ার গ্রামে অ্যান্তন আর তাঁর পরিবারের সবাই জার্মান ভাষায় কথা বলতেন। আদতে তাঁরা ছিলেন জার্মানিরই লোক, উদ্বাস্তু হয়ে ঢুকেছিলেন অস্ট্রিয়ায়। বলা যেতে পারে জার্মানি-আশ্রিত চেকে। এখন ওই অঞ্চলটা চেক রিপাবলিকের অন্তর্গত।

ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন অ্যান্তন আর রোজাইন। রোমান ক্যাথলিক ধর্মে অবিচল আস্থা তাঁদের। রবিবারে রবিবারে গ্রাম-সংলগ্ন গির্জায় প্রার্থনা আর যিশুর ভজনা ছিল জীবনচর্যার অঙ্গ। প্রতিবেশীরাও মিলেমিশে থাকতেন এই

পরিবারটির সঙ্গে। সুখে-দুঃখে দারিদ্র্যে-ভালোবাসায়, উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনিতে কখন যে সকাল হত আর কখন সন্ধ্যা তা টেরই পেতেন না অ্যান্তনেরা। মা-বাবার মনের মধ্যে স্বপ্ন জাগত ছেলে বড়ো হয়ে একদিন সব দুঃখ দূর করে দেবে।

সেদিন ২০ জুলাই। সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। সূর্যদেবের দেখাটি নেই। বর্ষাকাল। মাঝেমাঝেই ঝিরিঝিরি করে বৃষ্টিও হচ্ছে। তবুও মাঠে যেতে হয়েছে অ্যান্তনকে। ঘরে পূর্ণগর্ভা রোজি। তবে প্রতিবেশীরা আছে। তেমন ভাবনা নেই কোনও। যদি কিছু হয়, তারাই ব্যবস্থা নেবে। হলও ঠিক তাই। কাজের শেষে ঘরে ফিরে অ্যান্তন দেখলেন রোজাইন-এর কোল আলো করে ফুটফুটে এক ছেলে। তাকে ঘিরে উঁকিঝুঁকি মারছে তার ছোট্ট দিদি ভেরোনিকা। হাত দিয়ে ছুঁয়ে আদর করতে চাইছে ছোট্ট তুলতুলে লালচে রঙের ভাইটাকে। মা তাকে শাসন করছে। ছুঁস না, ছিঃ, নোংরা ধুলোয় ভর্তি তোর হাত। অ্যান্তনের বুক ভরে গেল পরিতৃপ্ত মা, মেয়ে আর ছোট্ট চোখবুজে থাকা লালচে রঙের নরম বাচ্চাটাকে দেখে।

গ্রামের গির্জার প্রধান পুরোহিতের কাছে খবর গেল। তিনি বলে পাঠালেন, পরশুই নিয়ে এস বাচ্চাকে। ওই দিনই দীক্ষা হবে ওর। নামকরণও করে দেব। তাঁর আদেশমতো মা-বাবা আর প্রতিবেশী ক'জন মিলে গির্জায় গেলেন শিশুপুত্রকে নিয়ে। সেখানে ক্যাথলিক ধর্মমতে আচার-অনুষ্ঠান মেনে ব্যাপ্‌টিজ্‌ম হল শিশুর। পুরোহিত তাঁর নাম রাখলেন জোহান। জোহান মেন্ডেল। সেদিন ছিল ২২ জুলাই, ১৮২২ সাল।

॥ দুই ॥

শৈশব ও শিক্ষারম্ভ

শিশু জোহান গ্রামের আর পাঁচটা শিশুর মতোই মা-বাবা আর দিদির আদরে যত্নে স্নেহে বেড়ে ওঠে। তবে বাবা অ্যান্তন একটু কড়া ধাতের মানুষ। ছেলে একটু বড়ো হতেই, খুব বেশি আদর দিয়ে বাঁদর করতে চান না তাকে। যিশুর কাছে প্রার্থনা করেন, ছেলে যেন বড়ো হয়ে বাপের দুঃখ বুঝতে শেখে।

মোরাভিয়া অঞ্চলের আর দশটা গ্রামের মতোই হাইন্‌জেন্‌ডর্ফ গ্রামের মানুষরাও বড়ো গরিব। নিজের অথবা পরের খেতে চাষবাস করেই খেতে হয় তাদের। কাজেই ছেলেকে বিলাসী করলে চলবে না। ওকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তাই একটু বড়ো হতেই জোহানকে নিজের সঙ্গে মাঠে নিয়ে যেতে শুরু করলেন অ্যান্তন।

সেই ছোটোবেলাতেই বাবাকে চাষ-আবাদের কাজে সাহায্য করত ছোট্ট জোহান। গাছের বীজ, চারা, গাছ লাগানো, গাছের যত্ন, তাতে ফুল ধরা, ফল ধরা—এসব খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করত সে। কতরকমের যে গাছ, আর কতরকমের যে ফুল! তাদের জমির মালকিন ছিলেন কাউন্টেস মারিয়া ট্রাকসেস-জিয়েল। তাঁর কাছে সময়-অবসরে যেত জোহান, একটু-আধটু প্রশ্রয়ও পেত সেখানে। তাই হয়তো বাবার নির্দেশে আর মারিয়ার প্রশ্রয়ে চাষবাস করে জীবন কাটানোই একদিন নিয়তি হয়ে যেত তার।

কিন্তু ক্রমে, তার সমবয়সী বন্ধুদের ইস্কুলে যেতে দেখে বালক জোহানের মনেও একটু-আধটু লেখাপড়া করার ইচ্ছা জাগে। মায়েরও খুব ইচ্ছা, ছেলে লেখাপড়া শিখুক। লেখাপড়া শেখা লোককে কত মান্য করে সবাই। অ্যান্তনও যে একেবারেই খুব অরাজি ছিলেন তা বলা যায় না। তা ছাড়া, আজকালকার দিনে একেবারে মুখ্যু হয়ে থাকা কি মানায়? অতএব স্ত্রী-পুত্রের আগ্রহে আর গ্রামের কিছু প্রবীণ মানুষের পরামর্শে অ্যান্তন ঠিক করলেন জোহানকে ইস্কুলেই ভর্তি করে দেবেন।

১৮৩১ সালের এক শীতের সকালে অ্যান্তন ছেলেকে নিয়ে গেলেন লিপনিক-এর পিয়ারিস্ট বিদ্যালয়ে। জোহানের বয়স তখন ন'বছর। সেখানকার প্রধানশিক্ষক ছেলের মেধা পরীক্ষা করে বেশ খুশি হয়েই ভর্তি করে নিলেন তাকে। প্রধানশিক্ষকের প্রত্যাশা পূরণ করে বালক